বনস্পতির ছায়া

প্রবুদ্ধ বাগচী

পি জি হাসপাতালের ডেপুটি সুপারের ঘরের সামনেটায় সেদিন প্রচণ্ড ভিড়। হয়তো এমনটাই প্রতিদিনের ছবি। ভিড় ঠেলে ঘরের মধ্যে পৌঁছাতে বেশ ঘাম ঝরাতে হল আমাকে আর আমার এক চিকিৎসক বন্ধুকে, যিনি সেই মুহূর্তে ওই হাসপাতালেই কর্মরত। আমাদের সমস্যাটা ঠিক রোগীভর্তি করা না- করা নিয়ে নয়। একটু আলাদা। আমার এক বৃদ্ধ আত্মীয়কে মেডিকাল কলেজ হাসপাতাল থেকে তার আগের দিন রেফার করে দেওয়া হয়েছে পিজি হাসপাতালের ডায়ালিসিস ইউনিটে। গুরুতর কিডনি সংক্রান্ত অসুস্থতায় আক্রান্ত ওই রোগীকে ডায়ালিসিস করিয়ে আবার ফেরত নিয়ে যাওয়া হবে মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে। সমস্যা হল, সেই মুহূর্তে ডায়ালিসিস ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিব্রত চিকিৎসক সহজ যুক্তিতে পেছনে ফেলে দিয়েছেন আমাদের আশি – ছুঁই ছুঁই বৃদ্ধ রোগীকে। যুক্তিটা এই, ওঁর তো এমনিতেই বয়স হয়েছে, ফলে ডায়ালিসিসের মতো প্রাণদায়ী চিকিৎসার সুযোগ আগে দেওয়া হোক তুলনায় তরুণতর কোনও রোগীকে, বিশেষ করে যখন একটা পরিষেবাগত ঘাটতি থেকেই গেছে!

হয়তো এই বিবেচনার একটা গ্রাহ্য যুক্তি ছিল। একটু নিরপেক্ষ অবস্থানে দাঁড়িয়ে ভাবলে সেটা স্পষ্ট হয়। কিন্তু চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আনা রোগীর কাছে লোকের সামনে এই সিদ্ধান্তের কোনও প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে বেড়ানো সম্ভব নয়। সুতরাং বিপন্ন রোগীকে বারান্দায় ট্রলিতে শুইয়ে রেখে আমরা পৌঁছাই ডিপুটি সুপারের ঘরে। বুঝিয়ে - সুঝিয়ে, কিছুটা অন্যপ্রভাব খাটিয়ে ব্যবস্থা হয় দ্রুত ডায়ালিসিসের। আরও মাসখানেকের চিকিৎসায় তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু বয়সের ক্রমবিচারে চিকিৎসা পাওয়ার ক্রম ঠিক করে নেওয়ার এই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত কি তৈরী করে দেয় না আরও কয়েকটা জরুরি প্রশ্নের আদল?

সেই প্রসঙ্গে আসব। তার আগে আমরা একবার মনে করে নিই যতীন্দ্রনাথ শীলকে। এই বৃদ্ধকে কি মনে পড়ে আপনাদের? বই-প্রেমিক এই বৃদ্ধ প্রতিবারের মতো সেবারেও গিয়েছিলেন বইমেলার মাঠে। কলকাতা বইমেলা ১৯৯৭। সেইবারেই অবিবেচনা আর স্বজনপোষণের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল বইমেলা। সেই ভয়াবহ বিকেলে যে - যার প্রাণবাঁচাতে যখন এলোপাথাড়ি দৌড়াচ্ছেন, ওই বৃদ্ধ সেই উন্মত্ত ভিড়ের ধাক্কায় পড়ে গিয়েছিলেন মাটিতে। আর কয়েক হাজার মানুষের পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে তাঁর মৃত্যু হয় সেইদিন। বইমেলার এযাবৎ কালের ইতিহাসে প্রথম শহীদ তিনি। খেয়াল করে দেখবেন, গত দশবছরে কলকাতা বইমেলার স্থান - কাল- পাত্র নিয়ে যতরকম লম্বা - চওড়া বিরোধ - বিতর্ক, যতরকম দেশ-বিদেশের গুণী তাত্ত্বিকদের আনাগোনা নিয়ে নরক-গুলজার তার মধ্যে ওই পদপিষ্ট হয়ে যাওয়া মানুষটি কোথাও নেই। সে কি তাঁর বয়স সেইসময় সাতষট্টি ছিল বলে, যাকে আমরা ভালবেসে বলি 'সিনিয়র সিটিজেন'?

আসলে দুটো প্রশ্নকে এক করে দেখলে সাধারণভাবে যে জিজ্ঞাসাটা তৈরী হয় তা হল, আমরা আমাদের বয়স্ক নাগরিকদের ঠিক কেমন চোখে দেখি বা দেখতে চাই। আমরা মানে বাকিরা, যারা এখনও সিনিয়র সিটিজনের শিরোপা অর্জন করতে পারেনি। অবশ্য বলে রাখা ভাল, সিনিয়র সিটিজেনের ধারনাটা একটা নেহাতই সরকারি ধারনা যার বয়স খুব একটা বেশি নয়। বয়স্করা চিরকালেই জনসংখ্যার একটা অংশ হয়ে সমাজে রয়েছেন, থাকবেনও। কিন্তু কীভাবে আমাদের সমাজ, আমাদের সাহিত্য - সংস্কৃতি দেখতে চেয়েছে এই অংশকে?

জানি, অনেকের মুখেই এই প্রশ্নের একটা চটজলদি জবাব আছে। বেশিরভাগ মানুষ বলবেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ঘিরে সামাজিক - পারিবারিক উপেক্ষা, উদাসীনতা আর একরকম অপমানিত অনুকম্পার কথা। ঠিক। আমাদের চারপাশে যদি নজর রাখি, যদি প্রতিদিনের চলাফেরায় খেয়াল রাখি, যদি সংবাদ দৈনিকের পাতা ওল্টাই, চোখ রাখি হাজারো টি.ভি - চ্যানেলের সংবাদ প্রবাহে তাহলে এরকমই একটা মলিন ছবির সামনে আমাদের দাঁড়াতে হয়। কোথাও ছেলে - মেয়েরা আশ্রয় ও ভরণপোষণের দায় অস্বীকার করায় বৃদ্ধ মা- বাবা বিপন্ন, আদালতকে গিয়ে নাক গলাতে হচ্ছে তাদের পুনর্বাসনে, কোথাও সম্পত্তির লোভে তাঁদের ওপর চলছে নির্যাতন। যদিও কেবলমাত্র বাবা - মায়ের সঙ্গে তাঁদের পরিণত পুত্র - কন্যাদের সম্পর্কে টানাপোড়েনের এইসব কদর্য দৃষ্টান্তগুলিই বয়স্কদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির একমাত্র স্মারক বলে ধরে নিলে ভুল হবে। মনে রাখা দরকার, বৃদ্ধ স্কুলশিক্ষকদের তাঁর প্রাপ্য পেনশন বা অন্যান্য পাওনা টাকা আদায় করার জন্য সরকারি দফতরে বিপন্ন হয়ে ঘুরে বেড়ানোর করুণ চিত্র, কোথাও আদালতের রায় পাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকার নির্বিকল্প জলছবি। এমনকী একেবারে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য বরাদ্দ বিভিন্ন সরকারি ভাতা - অনুদানের অর্থও কোন অন্ধকার পথে উধাও হয়ে যায় সেই খবরও প্রায়ই চোখে পড়ে। সাম্প্রতিক সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা হিন্দি চলচ্চিত্র/ লগে রহো মুন্নাভাই' এর একটি দৃশ্য ভাবুন। যেখানে এক বৃদ্ধের কাজ করে দেওয়ার বিনিময়ে এক সরকারি কর্মচারি উৎকোচ দাবি করছেন আর বিপন্ন সেই বৃদ্ধ নিজের চশমা - শার্ট - ঘড়ি খুলে দিচ্ছে তার সামনে! নিছক সিনেমা নয়, এগুলো জীবন্ত বাস্তব। যার মধ্যে দিয়ে আসলে প্রকাশ হয় একটা দৃষ্টিভঙ্গি। এসব তো নিতান্ত সাধারণ মানুষের কথা, কিন্তু আশ্চর্যব্যাপার হল, যাঁদের আমরা একসময় সেলিব্রিটি বলে আইডল বানিয়ে রাখি, নজর করে দেখবেন, একটা বয়সের পর সেই উদ্বেলিত 'পাবলিক' -ই কেমনভাবে এদের বর্জন করেন। কথাটা ভীষণ সত্যি চলচ্চিত্র তারকাদের ক্ষেত্রে এবং খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে, যাঁদের আমরা 'বুড়ো' বলে চিহ্নিত করে দিই। ঠিক যখনই তাঁদের স্ব-স্ব ক্ষমতায় কিছু কিছু ঘাটতি চোখে পড়তে থাকে। একসময় কলকাতা ময়দান - কাঁপানো ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য, মিহির বসু, জেভিয়ার পায়াস, হাবিব, আকবর প্রমুখদের ক্ষেত্রে দেখেছি পরের দিকে মাঠের দর্শকরা 'বুড়ো' 'বুড়ো' বলে প্রকাশ্যে ধিক্কার ছুঁড়ে দিতেন তাঁদের উদ্দেশ্যে। একইভাবে কিংবদন্তী ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকার - গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ - মহিন্দার অমরনাথ - চন্দ্রশেখর - কপিলদেব - আজহারউদ্দিনকেও শুনতে হয়েছে একইরকম ধিক্কার, তাঁদের একদা - সমর্থকদের কাছ থেকে। হয়তো দু - এক বছরের মধ্যে শচীন - সৌরভ - রাহুল - কুম্বলেকেও শুনতে হবে একই কটূক্তি। আসলে শেষ পর্যন্ত এগুলো একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিরই সামাজিক প্রতিফলন। বয়স্ক নাগরিকদের জন্য ব্যাঙ্কের মেয়াদী আমানতে দু - চারআনা বাড়তি সুদের বন্দোবস্ত করে বা রেলভাড়া - বিমানভাড়ায় তাদের জন্য কিছু ছাড় দিয়ে সামগ্রিকভাবে এই প্রবণতাকে প্রতিহত করা যাবে বলে মনে হয় না। বরং আমাদের বহুস্তরীয় সমাজে যে প্রতিযোগিতার একটা দুঃসহ আবহ সবদিক দিয়ে তৈরী হয়েছে, সেখানে কারোর জন্য বা কোনও অংশের জন্য বাড়তি সুবিধার ব্যবস্থা করা মানেই বাকিদের মধ্যে একটা পাল্টা ঈর্ষার ক্ষেত্র তৈরী করা। এই দিকটাও সম্ভবত ভেবে

দেখা প্রয়োজন।

একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসতে চায়, বয়স্ক - বয়স্কাদের প্রতি সামাজিক এই উপেক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিটির মূল সূত্রটা কোথায়? কেউ কেউ আছেন, যাঁরা এই প্রবণতাটাকে নিতান্তই ‘আজকালকার’ ধরন বলে চিহ্নিত করে দিতে চান। কিন্তু এই ‘আজকাল’ - পন্থীদের প্রশ্ন করলে দেখা যাবে তাদের নিজেদের কাছেই আজ অথবা কালের সীমানাটা খুব স্পষ্ট নয়। এই অস্পষ্টতার ধাঁচটাকে ভেঙে ফেলার জন্য হাতের কাছে থাকা দুটো দৃষ্টান্ত সহজেই টানা যায়। সত্যজিৎ রায়ের দুটো ছবির কথা মনে করা যায়। একটি ‘সীমাবদ্ধ’ অন্যটি ‘পথের পাঁচালী’। গত শতকের ষাটের দশকে তৈরী হওয়া ‘সীমাবদ্ধ’ ছবির নায়ককে আমরা দেখেছিলাম পেশাগত জীবনের স্বপ্নিল হাতছানিকে মেনে নিয়ে সে কিন্তু বৃদ্ধ বাবা-মা-কে তার ঝকঝকে কোম্পানির ফ্ল্যাটে ঠাঁই দিতে পারেনি। তার শ্যালিকার কলকাতা আসার সংবাদ পেয়ে তার বৃদ্ধ বাবা যেদিন তার ফ্ল্যাটে এলেন সেই সন্ধ্যায় নায়ক শ্যামলেন্দু সহকর্মীদের সঙ্গে পানভোজনে মশগুল, কাঁচুমাচু বৃদ্ধ পিতা কোনওক্রমে ভিতরের ঘরে গিয়ে নিজের মান বাঁচান। কেরিয়ার সর্বস্ব শ্যামলেন্দু শুধু কৌশলী শ্রমিক নেতাকে দিয়ে নিজের প্রোমোশনের সোপান তৈরী করেন তা-ই নয়, ব্যক্তিজীবনেও বাবা - মা-র প্রতি দায়বোধে সে বিচ্যুত! আর, ‘পথের পাঁচালী’র ইন্দির ঠাকরুনকে তো সমস্ত বাঙালিই চেনেন সর্বজয়ার সংসারের আশ্রিত এক প্রান্তিক বৃদ্ধা হিসেবে - অপমান, উপেক্ষা আর ঔদাসীন্য নিয়ে যিনি অপেক্ষা করেন অন্য পারে যাওয়ার। এমনকী সত্যজিতের অনবদ্য চিত্রায়ণে সেই বৃদ্ধার মৃত্যুটাও হয়ে ওঠে যতটা না ট্র্যাজিক তার থেকে অনেক বেশি আনইভেন্টফুল (uneventful)। অথচ ইন্দির ঠাকুরণদের সময়টা এই আজকের সময় থেকে প্রায় একশ বছর আগের। সুতরাং ‘আজকাল’ এর তত্ত্বটা ভুলে গিয়ে এই সমস্যাটার শিকড় খোঁজার জন্য আরও একটু গভীর অভিনিবেশ দরকার।

এই অনুসন্ধানের পথ ধরেই মনে হয়, আমাদের সমাজ বোধহয় তার আদিকাল থেকেই বয়স্ক জনগোষ্ঠী সম্পর্কে কোনও সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করতে চায়নি। তার সবথেকে বড় উদাহরণ, প্রাচীন সমাজে চালু থাকা বানপ্রস্থের ধারনা। বানপ্রস্থের পুরোন রীতি অনুযায়ী একটা বয়সের পর বৃদ্ধ - বৃদ্ধারা তাঁদের উত্তরপ্রজন্মের হাতে সংসারের দায় সঁপে দিয়ে চলে যেতেন সাংসারিক সীমানার বাইরে। যে কোনও সময়কালেই যে কোনও জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা থাকবেন এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু জীবনের উৎপাদনশীলতা ফুরিয়ে যাওয়ার পর যখন তাদের নির্ভরতার জায়গা বেড়ে যায় তখন যদি চেনা সমাজ বা সংসারের পরিসরে তাঁদের ঠাঁই না হয় এবং সমাজ যদি এই বিচ্ছিন্নতাকে প্রথার কাঠামোয় বাঁধতে চায় তাহলে তাকে সামাজিক দুর্লক্ষণ বলে চিহ্নিত করাই সংগত। তৎকালীন সমাজের দিকনির্দেশ যাঁরা করতেন, যদি বলি, বাণপ্রস্থের আড়ালে তাঁরা এক কদাচারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন! এই বাণপ্রস্থের ধারণাকে সামনে রেখে বৃদ্ধ - বৃদ্ধাদের জন্য এক ধরণের আশ্রম - মঠ জাতীয় অস্থায়ী আবাসের প্রচলন হয়েছে সেই পুরোন আমল থেকে। ইতিহাস জানাচ্ছে প্রায় তেইশশো বছর আগে রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য রাজত্ব ছেড়ে বানপ্রস্থে গিয়েছিলেন। আধুনিক নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় মেট্রোপলিসের সাতশ সাড়েসাতশো স্কোয়ার ফুটের চেপেচুপে থাকা নিউক্লিয়াস পরিবার থেকে ছিটকে গিয়ে বৃদ্ধ - বৃদ্ধারা যখন বৃদ্ধাশ্রমের বাসিন্দা হয়েযান, হালআমলের সংগীতকার তাদের নিয়ে যতই গান বাধুন, তা তবু একটা যোগ্য ব্যাখ্যা থাকতে পারে, কিন্তু বানপ্রস্থের সমাজ তো গ্রামনির্ভর মুক্ত অবাধ স্থান - সংকুলানযুক্ত খোলা পরিসর, সেখানে কেন ধরে রাখা যায় না পরিবারের প্রান্তীয় বয়স্ক সদস্যদের? নচিকেতা-র ‘বৃদ্ধাশ্রম’ গানের খোকাটি যদি আজ এই বিপরীত প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় অবশিষ্ট সমাজের কাছে কী জবাব আমরা তুলে ধরব তার সামনে? বরং, সমাজ - অর্থনীতি - পারি - পার্শ্বিকতা - প্রয়োজনের জরুরি তাগিদ সব কিছুকে মেনে নিয়ে আধুনিক একজন যুবক বা যুবতী যখন বাধ্যত একা ফেলে যান তাঁর বৃদ্ধ মা - বাবাকে বা বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাতে হয় তাঁদের, তারমধ্যে কোথাও একটু নিরুপায় দ্বন্দ্ব হয়তো কাজ করে, অথচ বানপ্রস্থকে যাঁরা বৈধতা দিয়েছেন তাঁরা সুধুই নিয়মের দোহাই পেড়েছেন এবং এই নেতিবাদী মানসিকতাকে মহিমান্বিত করেছেন! এই অপরাধ ঐতিহাসিক!

পাশাপাশি আরও একটা প্রবণতা খেয়াল করবার মতোন। আমাদের সাহিত্য - আখ্যান - সঙ্গীত - চলচ্চিত্র - নাটকের যে মূল শক্তিশালী ধারা সেখানে কিন্তু শুধু যৌবনেরই জয়গান, শুধু যৌবনই সেখানে গ্লোরিফায়েড- যেমন মানবজীবনের ওই একটি পর্যায়কে ঘিরে জীবনের যত ঘাত - প্রতিঘাত - জটিলতার ঘুরে ফিরে বেড়ানো, তার বাইরে কোনও জীবন নেই! আমাদের প্রেমের গল্প, প্রেমের উপন্যাস, প্রেমের কবিতা কেবলই যৌবনের রোমান্সকে ধারণ করে, সেখানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা - প্রৌঢ় - প্রৌঢ়ার প্রেমের উচ্চারণ, কই তেমন করে তো পেলাম না আমরা! এক - আধটি ব্যতিক্রম যে নেই তা নয় কিন্তু খুব গড়পড়তা জীবনচিত্রণে জীবনের ছবি যেন এক রঙে আঁকা, বার্ধক্যের ধূসরতাকে আমরা কেন যেন ব্রাত্য করে রেখেছি।

খুব নির্দিষ্ট করে বাংলাভাষার কথাই যদি ধরি, একেবারে এক নিঃশ্বাসে কি বলে দিতে পারব এমন কিছু গল্প - উপন্যাসের কথা যেখানে নায়ক চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছেন কোনও বৃদ্ধ নায়ক বা নায়িকা? অথবা যে মূলধারার বাংলা আধুনিক গানে একসময় বাঙালির রীতিমতোন মজে যাওয়া সেখানেও তো শুধু যৌব - প্রেমের জয়জয়কার। নিজের বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে লেখা গানওয়ালা সুমন চট্টোপাধ্যায়ের গান তো একেবারেই হাল আমলের ঘটনামাত্র! যার আগে বা পরে কোনও দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এখনও অমিল। আবার, যে মেইনস্ট্রীম বাঙলা সিনেমাকে ঘিরে গত শতাব্দীর বাঙালি সমাজের প্রধানতম বিনোদন, সেই উত্তম - সুচিত্রা ব্র্যান্ডেও কিন্তু যেসব নায়ক - নায়িকার ছবি তৈরি হয় সেখানে মূল উপাদান কম বয়সী প্রেমের ট্রাজেডি বা কমেডি। এসব সিনেমার নায়ক - নায়িকারা পৃথিবীটাকে স্বপ্নের দেশ ভেবে নিয়ে গতিময় অনন্ত সংলাপে মগ্ন থাকেন কিন্তু খোঁজ রাখেন না, সেই পৃথিবীটা সত্যিই শুধু তাঁদের না কি সেটা আরও কিছু বয়স্ক মানুষেরও বাসভূমি! সিনেমার কথা যখন উঠলই তখন অন্য একটা প্রসঙ্গও টানতে ইচ্ছে করছে। এক অগ্রজ লেখক বন্ধুই অবশ্য উসকে দিয়েছিল এই ভাবনাটা। বাঙলা সিনেমার জনপ্রিয়তম নায়িকা সুচিত্রা সেনের স্বেচ্ছানির্বাসনের মধ্যে কি কি তাঁর যৌবনের নায়িকা - ইমেজকে জনমানসে স্থায়ী করে রাখার ভাবনাটাই কাজ করল বেশি বেশি করে? এ যেন কৃত্রিম এক ব্যবস্থায় যৌবনকে অন্তরে রাখার চেষ্টা! বাঙালির মনে প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা সুচিত্রা সেনের কোনও ছবি আজও নেই, যদিও তাঁর বয়স থেমে থাকেনি, কিন্তু সেই বার্ধক্যকেও তিনি লুকিয়ে রাখলেন জনমানস থেকে। পরোক্ষে যেন এই মোহময়ী রূপসী নায়িকা স্বীকৃতি দিতে চান শুধুই তাঁর যৌবনকে। একদা বাঙালি মানুসের এই আইডল প্রকারান্তরে যেন খারিজ করতে চান বার্ধক্যে পৌঁছেও একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অনেকটা দেওয়ার থাকতে পারে। কারওর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তও ময়নাতদন্ত করা হয়তো তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে বেয়াড়া হস্তক্ষেপ বলে কেউ অনুযোগ করতেই পারেন কিন্তু সুচিত্রা সেনের সমকালীন অনেক অভিনেতা - অভিনেত্রী এখনও সার্থকভাবে অভিনয় করে চলেছেন। তাঁদের যৌবনের নায়কোচিত ইমেজ হয়তো আজ আর নেই কিন্তু বার্ধক্যেরও একটা রূপ আছে,

সেই রূপকে কি আমরা অস্বীকার করতে পারব?

আমরা অস্বীকার করি বা না-ই করি বার্ধকের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো কিন্তু তৈরী হয়ে যায় এইসব ধারণাগুলিকেই অনুসরণ করে। আর, সমাজের পরিবর্তন ঘটলেও কোথাও মূল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গির পুরোন আদল ছায়া ফেলে যায় আমাদের ব্যবহারে - আচরণে - অভ্যাসে প্রথায়। যায় বলেই তার মধ্যে লুকিয়ে তাকে কখনও উপেক্ষা, কখনও উদাসীনতা। আবার এর মধ্যে কোথাও বাসা বেঁধে থাকে কায়েমী স্বার্থের আজ্ঞাবহ লিঙ্গগত শোষণ বা নির্যাতনেরও একটা চেহারা যখন শোনা যায় বৃন্দাবন বা হরিদ্বারের বিধবা - আশ্রমগুলিতে কী দুর্বিষহ অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছেন পরিবার - বিচ্ছিন্ন বৃদ্ধারা! শেষ জীবনে ‘হরি’র চরণে আশ্রয়কামী বৃদ্ধাদের করুণ নির্যাতনের কাহিনী শোনার অবকাশ অবশ্য ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিনিধিদের নেই, বরং ঈশ্বরের প্রতিমাবেদীর সামনে বসিয়ে তারা এই বিপথ বৃদ্ধাদের দিয়ে ভিক্ষা করান, তাঁদের অভুক্ত রেখে তাঁদের শ্রম আত্মসাৎ করেন। নন্দীগ্রামের ওই অত্যাচারিত বৃদ্ধার টিভিতে ভেসে ওঠা মুখের পাশে এইসব না- দেখা মুখগুলির জীবনজুড়ে যে মানবাধিকারের অপার লঙ্ঘন, আমরা কি সেই খেয়াল রেখেছি কখনও?

কিন্তু এই কথা বলে বসা অনৃতভাষণ যে সামাজিক এইসব ভুল মূল্যবোধের অন্তরালে কোথাও কোনও বিপ্রতীপ ভাবনার ইতিউতি ইশারা নেই। মনে পড়ছে, ছোটবেলায় বাবার কাছে শোনা সেই গল্পটার কথা। এক বৃদ্ধ মৃত্যুকালে তাঁর সন্তানদের বলে গিয়েছিলেন কয়েকটি উপদেশের কথা। তার একটি ছিল, বিপদে বা সমস্যায় পড়লে পরামর্শ নিতে যেও তিনমাথার কাছে। অনেকদিন পর্যন্ত ছেলেরা এই ‘তিনমাথা’র রহস্য ভেদ করতে পারেনি। পরে তারা বুঝেছিল ‘তিনমাথা’ মানে ন্যুব্জ হয়ে যাওয়া বৃদ্ধকেই বোঝাতে চেয়েছেন তাঁদের প্রয়াত পিতা। এই লোকগাথায় হয়তো বৃদ্ধের প্রাজ্ঞতার একরকম স্বীকৃতি রয়েছে। ইংরেজিতেও একটা প্রবাদ আছে, হোয়েন অ্যান ওল্ড পার্সন ডায়েজ, এ লাইব্রেরি ইজ লস্ট (when an old person dies, a library is lost), যার মধ্যে প্রায় একই ধরনের ভাবনার প্রতিধ্বনি রয়েছে।

একইরকম প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে আছে আমাদের চেনা দৈনন্দিনের আনাচে - কানাচে, চেনা অভিজ্ঞতার আড়ালে - আবডালে। আসলে সেগুলো খুঁজে নিতে আমাদের কিঞ্চিৎ আড়ষ্টতা আর কুণ্ঠা। নতুবা, আমরা ভুলে যাই কী করে, বাঙালির গত দেড়শ বছরের কালচারাল আইডল রবীন্দ্রনাথ, গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেমের উপন্যাস ‘শেষের কবিতা’ লিখেছিলেন তাঁর বৃদ্ধ বয়সে। পৃথিবীর যে কোনও ভাষার নাটকের সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বে তুলনীয় ‘রক্তকরবী’ ও লেখা হয়েছিল এক সত্তরোর্ধ বৃদ্ধের কলমে যিনি উনআশি পেরিয়েও গান বলতে পারেন ঃ প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে/ তাই স্বপ্ন মনে হল তার...রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বার্ধক্যে যে সৌন্দর্য আমরা দেখেছি তার কি কোনও তুলনীয় দৃষ্টান্ত মনে পড়ে? এই সৌন্দর্য আর আভিজাত্যের সূত্রেই মনে পড়ে যায় ‘জলসাঘর’ এর নায়ক বৃদ্ধ জমিদার বিশ্বম্ভর রায়কে, মনে পড়ে ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’র রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথকেও।

শুধু আভিজাত্যই বা কেন, ‘পদাতিক ’ চলচ্চিত্রের যুবক নায়ক বৃদ্ধ বাবার চরিত্রটার কথাও মনে না এসে উপায় নেই। প্রতিবাদী রাজনীতি থেকে পলায়নপর পুত্রের সমান্তরালে তিনি এক আপোষহীন প্রতিবাদী যিনি চাকরি হারাবার ঝুঁকি নিয়েও অফিস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করতে নারাজ। নারায়ণ সান্যালের ‘প্যারাবোলা স্যার’ এর মধ্যেও এই একই দৃঢ়তার ছবি আমরা দেখেছি। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় ‘আতঙ্ক’র সেই বৃদ্ধ মাস্টারমশাইকে যাঁকে বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হয় ‘মাস্টারমশাই, আপনি কিন্তু কিছুই দেখেননি!’ অথচ আত্মগ্লানি পেরিয়ে যিনি শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন! ‘বৃদ্ধা’ কথার ব্যঞ্জনার সঙ্গে আপাতভাবে জনিয়ে থাকা যে স্থবিরতার ছবি, যে আপোষমুখী ইশারা, যে অক্ষমতার উদাসীনতা এইসব টুকরো টুকরো দৃষ্টান্তে তা কিন্তু গরহাজির! ‘আপনজন’ ছবির সেই প্রতিবাদী বৃদ্ধা আনন্দময়ীর কথাও আমরা এই সূত্রে একটু ভেবে নেব যিনি ছবির শেষে দুর্বত্তদের হাতে নিহত হন। মনে করব, ‘শাখাপ্রশাখা’ চলচ্ছক্তিহীন বৃদ্ধকে যিনি পুত্রদের অধঃপতনে অনুভুতিকে শারিরীক বিভঙ্গে প্রতিবাদে রূপ দেন। এমনকী ‘গণশত্রু’র ডাঃ অশোক গুপ্ত যিনি সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে যান, বৃদ্ধ না হলেও তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পৌঁছানো এক একক চরিত্র।

এ লেখার শুরুতে যে আত্মীয় বৃদ্ধের কথা বলেছিল, সংস্কার মুক্তির প্রশ্নে তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত না বলে পারছি না। ওই ঘটনার প্রায় দশ বছর পর তিনি যখন প্রয়াত হন তার আগেই তিনি দেহদানের অঙ্গীকার করে গিয়েছিলেন। শতাব্দীর বয়সী এক বয়স্ক নাগরিকের পক্ষে এই মানসিকতাকে লালন করা বড় সহজ নয়! আরও কঠিন এইসব দৃষ্টান্তগুলো ভিতর দিয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে শুদ্ধতর করা। বৃদ্ধ বা বয়স্ক নাগরিকদের বিষয়ে চেনা ধারণাগুলো পাল্টে নেওয়া। হয়তো এমনটা আমরা সহজে পারি না বলেই- এসব আড়ালে থাকা মানুষদের দৃষ্টান্ত শুধুই ব্যতিক্রমী হয়ে থেকে যায়, কোনভাবেই তাঁরা মুলস্রোতে শরিক হতে পারেন না। এ আদের একরকম রুদ্ধতা, যে রুদ্ধতা দিয়ে আমরা সরিয়ে রাখতে চাই বয়স্ক জীবনের পরিসর, তাঁদের কেবলই দেখতে চাই আলাদা চেহারায়, আলাদা প্রতিমায়।

মনে পড়ে গেল, বেশ কয়েকবছর আগে কুমার শানু-র কণ্ঠে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল একটি বাঙলা গান, যাতে ধরা ছিল আশি বছরের বৃদ্ধা ঠাকুমাকে নিয়ে মজা আর বিদ্রূপ। সেই গানের কথাকার কে ছিলেন, জানি না, কিন্তু জনরুচির কদর্যতা নিয়ে এই গান যথেষ্ট বাণিজ্য করেছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অথচ সেই কথাকার কি মনে করে দেখবেন, বাংলা আধুনিক গানের কিম্বদন্তী মান্না দে আশি পেরোনো বয়সে আজও মঞ্চে এসে বসলে শ্রোতারা অভিভূত হয়ে যায়। এই সেদিন পর্যন্ত অসুস্থ শরীরে ভি. বালসারা কী সব চমৎকার সুর করেছেন। কী বলবেন, আশি বছরের অক্ষমতা। শেষ বিকেলের ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে যাওয়া ফ্ল্যাটে পরস্পরকে দেখতে - না- পাওয়া এক বৃদ্ধ দম্পাতির অনুভবকে একটি গানে ধরতে চেয়েছেন কবীর সুমন। বেশিরভাগ বাঙালি সেই গান শোনেননি, শুনতে চাননি। বরং তাঁরা মজে থেকেছেন ‘কহো না পেয়ার হ্যায়’ এর নেশায়। এটাই আমাদের সব থেকে বড় ট্রাজেডি, সব থেকে ভয়ংকর দুর্ভাগ্য।

ইদানিংকার বিশ্বায়নের হাওয়ায় মাতাল আমাদের মূলস্রোতের নাগরিকদের একটু ভয়ে ভয়েই স্মরণ করিয়ে দিই, এই সেদিন, ইরাকের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ শুরু করার পর মার্কিন দেশের রাষ্ট্রপতির বাসভবনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদী অবস্থানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন যিনি, তাঁর নাম নোয়ম চমস্কি— কী আশ্চর্য, তিনি ও আমাদের পরিভাষায় একজন সিনিয়র সিটিজেন!

বনস্পতিদের ছায়া দেওয়ার এইসব গল্প কি আমরা ভুলে যাব?